International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 20-29
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.264

তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ: মেদিনীপুর জেলার প্রেক্ষাপট

রাজীব বেরা

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক– ১, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 04.04.2026; Accepted: 06.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Tebhaga Movement is an important chapter in the history of India's freedom struggle and the farmers' movement. In order to implement the recommendations of the Floud Commission, farmers from about 19 districts of Bengal joined this movement in 1946-47. This movement took an all-out form in Midnapore district and a large section of the women's society of the district played an important role in this struggle. Bimala Maji took a leading role in promoting and organizing the movement among women in this district. She was the first-line leader of this district and propagated the movement almost on foot throughout the district. She formed the "Women's Army" in the district. Other leaders of the district were Purnima Patra, Revati Bala Mandal, Lakshmi Bala Gayen, Kamala Giri, Aarti Mandal etc. This movement took a militant form in a vast area of Sutahata, Mahishadal, Nandigram, Keshpur, Daspur, Ghatal, Garbeta in the Medinipur district. The subject of my article is how women, after being oppressed for ages, engaged in the struggle to establish their rights and dignity under the leadership of peasant organizations and wrote history.
Keywords - Tebhaga, movement, struggle, rights, leading, militant form, women, history.

ভূমিকা:

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে, অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলন এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ক্রমশ সারা বাংলার প্রায় ১৯ টি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এক ব্যাপক গণ সংগ্রামের রূপ নেয়। উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগের দাবিতে সমগ্র বাংলার প্রায় ৬০ লক্ষ ভাগচাষী- বর্গাদারেরা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জমিদার- জোতদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে বঞ্চিত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর শ্রেনী বীরত্বের সঙ্গে যোগদান করেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল। এই সংগ্রাম গ্রাম বাংলায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে কৃষকদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে- নভেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল যখন আমন ধান কাটা হয়। কৃষক সভার স্বেচ্ছাসেবকরা বর্গা চাষীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং কৃষকদের খামারে ধান তোলার চেষ্টা করলে আন্দোলনের সূচনা হয়, অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল জলোচ্ছ্বাস এর মত ছড়িয়ে পড়ে। শুধুমাত্র বাংলা নয়, ভারতের সংগঠিত কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন এক বিশেষ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে "ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন"। ডি. এন. ধনাগারের মতে,- "এটি ছিল ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত কৃষকদের প্রথম সচেতন বিদ্রোহের প্রয়াস" ।[১]

তেভাগা কি:

সাধারণভাবে তেভাগা শব্দের অর্থ হলো তিন ভাগ অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ। ১৯৪৬- ৪৭ সালে বাংলার দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি, মালদা, ও মেদিনীপুর সহ প্রায় ১৯ টি জেলায় বর্গাদার বা আধিয়ার বা ভাগচাষি কৃষকেরা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উৎপন্ন ফসলের দুই- তৃতীয়াংশ দাবি করে জমিদার, জোতাদার, ও ধনী কৃষকদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। যেহেতু উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগ ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই সূত্রে এই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। অধ্যাপক সুনীল সেনের মতে, "কৃষক সভা তেভাগা আন্দোলনকে জমিদারি প্রথা বিলোপের এবং কৃষকের হাতে জমি নাস্ত করার দাবির সঙ্গে যুক্ত করেছিল"।[২]

ফ্লাউড় কমিশন গঠনের দীর্ঘ পটভূমি লক্ষ্য করা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকেই বাংলায় কৃষকদের যে আর্থিক দুর্গতি শুরু হয়েছিল, তা মহামন্দা ও দুর্ভিক্ষের কারণে চরমে উঠেছিল। উপনিবেশিক শাসনে অতিরিক্ত খাজনার চাপ ও নানাবিধ করের বোঝায় কৃষকেরা ক্রমাগতই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। মহাজনের ঋণ মেটাতে গিয়ে চাষী তার জমি হারিয়ে ভাগচাষী তে পরিণত হয়। কৃষকদের এই দারিদ্র ও ঋণের ফলে বাংলায় বর্গাদার তথা ভাগ-চাষিদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ও ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রভাবে ভাগ চাষীদের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে বাংলায় বর্গাদারি ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রান্তিক কৃষকদের উক্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে ৫ ই নভেম্বর একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন গঠন করেন যা ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত।[৩] স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতি তে এই কমিশন গঠিত হয়েছিল বলে, এই কমিশন ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিতি পায়। ১৯৪০ সালে ২১ শে মার্চ কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন সুপারিশ করেছিল যে,-

> "our recommendation is… to treat as tenants Bargadars who supply the plough, cattle and agriculture implements....we also recommend that the share of the legally recoverable from them should be one third, instead of half..."[৪]

আন্দোলনের সূত্রপাত:

উপনিবেশিক শাসনের সূচনা লগ্ন থেকেই কৃষক সমাজ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সম্মিলিত হয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তিক কৃষকরা করমুকূব, কর ছাড়ের আন্দোলন করতে থাকে। পাঞ্জাবে গদর পার্টির নেতৃত্বে, গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে করমকুব করার দাবিতে কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে। ১৯২৯ সালে বিহার প্রাদেশিক কিষান সভা এবং ১৯৩৬ সালে সারা ভারত কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকে কৃষকরা উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র কর হ্রাস করে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা অর্জন করা যাবে না, প্রয়োজনে জমিদারদের তৈরি নিয়মগুলি বদলাতে হবে। এভাবেই উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবিতে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৭ সালে কমিউনিস্ট নেতা মনি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের চাষীরা টংক প্রথার বিরোধিতা করতে থাকেন। এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েই বর্গাদাররাও আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেন। এই সময় ফ্লাউড কমিশন তার সুপারিশ পেশ করলে, বর্গাদার কৃষক সমাজ তা আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে খুলনার কৃষকরা তেভাগা অতিরিক্ত ফসল খাজনা দিতে অস্বীকার করে এবং ধান কেটে নিজের গোলায় তুলতে থাকেন। ফলে জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটলে, আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে যশোহর জেলার পাঁজিয়া নামক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সম্মেলনে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সম্মেলনেই বর্গাদারেরা উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবিতে পুনরায় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬] তবে প্রকৃতপক্ষে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে ধান কাটার মরশুমে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমার আটোয়ারী থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। কৃষক স্বেচ্ছাসেবকরা ফসল কেটে জোতদারের গোলায় না নিয়ে, নিজেদের খামারে নিয়ে গেলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পুলিশ স্থানীয় নেতা সুশীল সেন কে গ্রেপ্তার করলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। এরপর ঠাকুরগাঁও শহরের কমিউনিস্ট নেতারা বৈঠক করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জেলার ২২ টি থানায় অতি দ্রুত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[৭]

মেদিনীপুর জেলায় আন্দোলনের সূত্রপাত, বিস্তার ও বিবরণ:

বাংলার অন্যান্য জেলার মতে মেদিনীপুর জেলাতেও এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। পূর্বেই এই জেলার কৃষকরা জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে নন্দীগ্রাম থানার পুরুষোত্তমপুরে ভাগচাষী কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক কৃষক সেবা থেকে অবনী লাহিড়ী সম্মেলনে যোগ দিয়ে ফ্লাউড কমিশনের কথা বলেন এবং ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ চাষীদের পাওয়ার কথা বলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভূপাল পান্ডা, অনন্ত মাজী, বঙ্কিম গিরি, রাখাল মন্ডল, চিত্ত গিরি, রজনী গুছাইত, প্রতিত জানা প্রমুখ।[৮] মেদিনীপুর জেলা কৃষক সমিতি চাষীদের দাবিগুলি তুলে ধরে আহ্বান জানায় যে,-

১. কৃষকদের খামারে ধান তোলা।
২. মন প্রতি ১০ সেরের বেশি সুদ নয়।
৩. বাজে আদায় বন্ধ করা।
৪. রশিদ ছাড়া ধান নাই।
৫. ভাগ চাষীর তেভাগা কায়েম করা।

বাংলা প্রদেশের গভর্নর ছোটলাটের কাছে মেদিনীপুর জেলা কৃষক সমিতি এক স্মারকলিপি দিয়ে জানায়, ভাগচাষীরা চাষের সমস্ত খরচ বহন করে থাকে, তাই জমির মালিকদের ফসলের তিন ভাগের এক ভাগের বেশি তারা দেবে না। স্মারকলিপি পত্রে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের কথা ও উল্লেখ করা হয়।[৯] জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, কেশপুর, দাসপুর ঘাটাল, ময়না, গড়বেতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষক সভার নেতৃত্বে কৃষক ও খেতমজুররা সংগঠিত হয়েছিল এই সংগ্রামে। যেসব বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক ও জঙ্গি রূপ গ্রহণ করেছিল, তারা হলেন- নন্দীগ্রাম থানার মনুচকের দেওয়ান সাহেব, কেন্দে মারির জানা পরিবার, মোহাম্মদপুরের পড়ুয়া ও মাইতি পরিবার, গড়চক্রবেড়ার খাঁ পরিবার, কালীচরণপুর এর সাগরদাস পরিবার, গোপালচকের সিন পরিবার, মহিষাদলের মাইতি পরিবার, সুতাহাটার শ্যামচরণ ত্রিপাঠী, পাঁশকুড়ার হরিসাধন চক্রবর্তী চৌধুরী, ময়নার আসনামের দাস পরিবার, কেশপুর অমন পুরের চৌধুরী পরিবার প্রভৃতি। প্রত্যেক মালিকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় এবং ওইসব আঞ্চলিক কমিটির দ্বারায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন নির্দেশ অনুসারে সংগ্রাম পরিচালিত হয়।[১০] ১৯৭৩ সালে ভূপাল পান্ডা তেভাগা সংগ্রামের রজত স্মারক গ্রন্থে মেদিনীপুরের তেভাগা সংগ্রাম প্রবন্ধে যেসব বড় বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার উল্লেখ

করেছেন। তিনি বলেছেন, এইসব জোতদারদের ছিল বিশাল বিশাল জমি। তারা ভাগে দিয়ে চাষ করাতেন। বিষয়টা ছিল শ্রেণী স্বার্থের লড়াই।[১১]

এই আন্দোলনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষদের সাথে সমানভাবে মহিলাদের বৃহত্তর অংশ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল গরিব খেতমজুর, বর্গাদার ও কৃষক পরিবারের মেয়ে। যদিও আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বে যে মহিলারা ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তারা প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের মেয়ে। সুতরাং এই আন্দোলনে কৃষক রমণীরা শ্রেণী চেতনা নিয়েই সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন করেছেন কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই।[১২] কমিউনিস্ট পার্টির সর্বত্রই নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছে। এই সংগ্রামে মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে তমলুক থেকে কৃষক নেত্রী বিমলা মাজীকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নন্দীগ্রাম অঞ্চলে পাঠিয়েছিল।[১৩] মেদিনীপুর জেলায় তিনি ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী। একদিকে তিনি কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন এবং অন্যদিকে থাকে নন্দীগ্রামে মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের প্রচার ও সংগঠিত করে আন্দোলনে যোগদানের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তিনি তা অসামান্য কৃতিত্বেই সম্পন্ন করেছিলেন এবং ইতিহাস রচনা করেছিলেন।

বিমলা মাজী ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। বাড়ি অবিভক্ত মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থানার চকদুর্গাপুর গ্রামে। জন্ম সাল সঠিক জানা যায় না, আনুমানিক ১৯২৫ সাল। বাবা ভাগবত মাইতি গ্রামের মাথাদের অন্যতম । নিজের গ্রাম সহ আশেপাশের গ্রামেরও নানান সমস্যা, অপকর্ম ও দোষ কর্মের বিচার করতেন। বাড়িতে রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল, তাঁর বাড়িতে আসতেন প্রথম সারির বিপ্লবীরা যেমন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অজয় মুখোপাধ্যায়, কুমার জানা প্রমূখ। সুতরাং বাড়িতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোচনার পরিবেশ ছিল।[১৪] বিমলা মাজীর ভাষায়, -

> "I was born in middle class peasant family. My Father used to work together with big Congress leaders like Kumar Jana and Biren Sasmol. My older brother, however was active for the Communist Party. We watched when he invited party comrades to eat and discuss at our home".[১৫]

খুব অল্প বয়সে মাত্র ১৩/১৪ বছরে তাঁর বিয়ে হয় এক রক্ষণশীল পরিবারে। যাদের পেশা ছিল ডাকাতি। ওই পরিবারে বিমলার কোনরকম অধিকারই ছিল না। প্রচন্ড নির্যাতনের স্বীকার হতেন তিনি এবং স্বামীর অত্যাচারে ও ছিলেন জর্জরিত। স্বামী মারা যাওয়ার পর এক বছরেরও বেশি তিনি লড়াই করেছেন গৃহ মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সম্পত্তির অধিকারের দাবিতে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময়। সেই সময় কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন তাঁর এলাকায় গ্রামাঞ্চল ঘুরতে যান যখন, মণিকুন্তলা সেনের সঙ্গী হিসেবে তখন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এরপর পার্টি নেতৃত্ব তাঁকে ওই এলাকার মহিলা সমিতি গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ দেন, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত শিশুদের মধ্যে দুধ বিতরণ, লঙ্গরখানা খুলে অন্যান্য মানুষকে খাবার যোগানোর মাধ্যমে। কিরে দুঃস্থ মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, যেমন- দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বশানের জন্য তাদের দিয়ে ঢেঁকিতে চাল কোটানোর উদ্যোগ নেন। এই কর্মসূচির নাম ছিল ধেনকি। জমিদারদের কাছ থেকে ধান নিয়ে এসে কুটে তা আবার পয়সা নিয়ে দিয়ে আসা। জমিদারদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।[১৬] চালু করেন মাদুর ও বেতের জিনিস বোনার ব্যবস্থা। সরকার মাদুর ও বেতের জিনিস কিনে নিত, মেয়েরা মজুরি পেতেন আধ সের চাল আর চার আনা পয়সা। মেয়েরাও স্বনির্ভরতার স্বাদ ও গুরুত্ব বুঝতে

পেরেছিলেন। কাজের জন্যই সারা জেলা হেঁটেই বেড়াতেন বিমলা, তিনি আবার জাহাজে চেপে বরিশালে সারা ভারত মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন। যাতায়াতের টাকা চাঁদা তুলে, আত্মীয়-স্বজনদের সোনার হার বিক্রি করে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি নিজে তমলুক সান্তনাময়ী গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুচরিতা দাশগুপ্তের কাছে লেখাপড়া শেখেন। তা কাজে এসেছিল, জন যুদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ির নির্দেশে তিনি ও লেখা পাঠাতেন। মেয়েদের বর্ণপরিচয় শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, স্লেট, বই মেয়েদের বিতরণ করতেন বিমলারা। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আত্মরক্ষা সমিতির অন্যান্য সদস্য কমলা মুখোপাধ্যায়, নারী সেবা সংঘের ফুলরেনু গুহ, রেনু চক্রবর্তী প্রমুখ গণ।[১৭]

বিমলার কর্ম তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্টি নেতৃত্ব তাঁকে মেদিনীপুর সদর থেকে নন্দীগ্রামে পাঠান। মূলত তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই তিনি নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে কৃষক রমণীদের সংগঠিত করা এবং আন্দোলনে নিয়ে আসার দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। প্রথম দিকে মেয়েদের সংগঠিত করা ছিল দুরূহ কাজ, কিন্তু তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গ্রামের মেয়েদের আন্দোলনে নিয়ে আসেন। তাঁর নেতৃত্বেই কেদামারি গ্রামে মহিলারা প্রথম মিছিল সংগঠিত করেন এবং আওয়াজ তোলেন- "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, আধি নয় তেভাগা চাই"। তাদের দাবি ছিল ন্যায্য রশিদ দিয়ে জমিদার তাদের ধান নেবে, অন্যথায় তারা ধান দেবে না। নন্দীগ্রামে একদম মহিলা লাল পতাকার সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে মাঠে জড়ো হন ধান কাটবে বলে। ফলে জোতদার/লেঠেলবাহিনী ও পুলিশের যৌথ আক্রমণের মুখে প্রতিরোধ গড়ে তোলে কৃষকরা, এর পুরোভাগে ছিলেন মেয়েরা। এরপরেই একজন কৃষক মেয়েকে জোতদারের কাছারিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পাহারা বাড়িরা কাচের গ্লাস দিয়ে মেয়েটিকে মারতে থাকে। এই খবর গ্রামে পৌঁছলে পাঁচ হাজার কৃষক যার মধ্যে ২০০০ কৃষক রমণী বাঁশের লাঠি হাতে কাছারি ঘেরাও করে। আমরা সবাই সমস্বরে স্লোগান দিলাম,- " যদি প্রাণে বাঁচতে চাও- তবে বেরিয়ে এসো, গ্রাম ছেড়ে পালাও। আর কখনোই ফিরে এসো না"। একে একে ৩০ জন দারোয়ান বেরিয়ে আসে। দু হাজার মহিলা যাওয়ার সময় তাদের ওপর লাঠি বর্ষণ করে এবং মুখে কালি লেপে দেয়, এরপর আর কৃষকের খামারে ক্ষেতের ধান তুলতে কোন অসুবিধা হয়নি।[১৮] ইতিমধ্যে বিমলার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়, পুলিশ প্রতিটি গ্রামে হানা দেয় তাঁকে ধরার জন্য এবং তিনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। বিমলার কথায়,- "একদিন পুলিশ আসার খবর পেয়ে মেয়েরা একজনকে গর্ভবতী সাজিয়ে গোল করে বসে পড়ে। সেই সুযোগে আমি দুজন বয়স্কা মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হই, সঙ্গে নিই বাঁশের বড় বাটি যার মধ্যে তুষ ভর্তি। পুলিশ উঠনে ঢুকলে মেয়েরা চেঁচামেচি করে তাদের আটকে দেয়, সেই সুযোগে আমি পালিয়ে যাই। সেদিন রাত্রেবেলা গ্রামের প্রত্যেক মেয়েদের ঘুমটা খুলে কপাল দেখাতে বাধ্য করে, কারণ আমার কপালে একটা কাটা দাগের চিহ্ন ছিল"। আন্দোলন চলাকালে বেশিরভাগ পুরুষ কমরেড গ্রেপ্তার হলে, তখন বিমলার উপরই দায়িত্ব এসে পড়ে দল ও কৃষক আন্দোলন পরিচালনার। আত্মগোপন অবস্থায় পুলিশ একদিন, মুসলিম গ্রামবাসীর ঘরে বোরখা পড়ে বিমলাকে মশারির তলা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১৪০ টি মামলা করে। প্রায় আড়াই বছর বিমলা কে কাটাতে হয় জেলের অভ্যন্তরে।[১৯]

বিমলার মত অপর এক নেত্রী হলেন সাধনা পাত্র, তাঁর কর্মস্থল প্রাথমিকভাবে গড়বেতা। তিনিও অল্প বয়সে বিধবা হন এরপর বাড়ির প্রভাব এই রাজনৈতিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন এবং সারা জীবন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে পার্টির কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেদিনীপুর জেলার প্রথম সম্পাদিকা। কৃষক পরিবারের জন্ম, তাই জন্ম সূত্রেই তিনি কৃষক আন্দোলনের পাশাপাশি নারী আন্দোলনে ও যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে তেভাগা আন্দোলন

সংগঠিত করতে গ্রামে গ্রামে প্রচারাভিযান চালিয়েছিলেন। কৃষক সভার ডাকে বহু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, আত্মগোপন অবস্থায় পার্টি মহিলা সমিতি এবং কৃষক সভার কাজ চালিয়ে যান। তেভাগা আন্দোলনে নারী বাহিনীর নেতৃত্বে তিনি ছিলেন জমিদার জোতদারদের ত্রাস। অত্যন্ত জঙ্গি কায়দায় তিনি নারী বাহিনীকে নিয়ে ধান সংগ্রহের কাজ করতেন, সেজন্যই এই বাহিনীকে ঝটিকা বাহিনি নামেও অভিহিত করা হয়। তিনিও ২ বছর কারা জীবন কাটিয়েছেন। কেশপুরের শিবরানি মিত্র ও ছিলেন এই আন্দোলনের অপর এক নেত্রী। তিনি কেশপুরের জমি আন্দোলনে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কেশপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ও সভাপতি। কমরেড মনি সিংহের দিদি, নির্মলা সান্যাল ও মেদিনীপুরের তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঊষা চক্রবর্তী, প্রমিলা পাত্র, সাধনা পাত্র প্রমুখ মহিলা নেত্রীদের নিয়ে গড়বেতা চন্দ্রকোনা, ঘাটাল প্রভৃতি এলাকায় জমি আন্দোলনে কৃষক সভার নেতৃত্বের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, গড়ে তুলেছেন নারী বাহিনী।[২০] এই আন্দোলনের অন্যান্য মহিলার নেত্রীবর্গ হলেন, পূর্ণিমা পাত্র, অন্নদা দাস, রেবতী বালা মন্ডল, বঙ্গ বালা জানা, লক্ষী বালা গায়েন, দুর্গারানী দাস, শান্তবালা বারিক, গিরিবালা পড়া, লক্ষ্মী রানী মন্ডল, অনা দাস, সুমতি মাইতি, জ্ঞানদাবালা দাস, সত্যভামা রাউত, কমলা গোল, কমলা গিরি, কুমুদিনী গোল, রমণী আরতী মন্ডল, হিরণ্যময়ী মন্ডল, পাখি বালা শেঠ, লক্ষী বালা দোলই, যশোদা রানী মাজী, প্রভাবতী দিন্দা, রেনুকা দিন্দা, প্রভাবতী দোলই, নন্দ রানী দিন্দা প্রমূখ।[২১]

তেভাগার দাবির ন্যায্যতা, ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ, রশিদ না দিয়ে জোতদার- মহাজন শ্রেণীর নির্মম শোষণের ঘটনাবলী তুলে ধরে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের কৃষকদের প্রতিবাদ ও ভাগ চাষীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাটে বাজারে ব্যাপক প্রচার ও পোস্টারিং চলে। মাঝে মাঝে সংগঠিত কৃষক বাহিনীর লাল ঝান্ডা উড়িয়ে আন্দোলন, এলাকা জুড়ে জঙ্গি কৃষক ভলেন্টিয়ার মার্চ সমগ্র এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেলার সর্বত্র ভাগচাষীদের মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামের পর গ্রামে ভূমিহীন ভাগ চাষী ও খেতমজুরেরা এই আন্দোলনে সামিল হয়ে নিজেদের সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে।[২২] যেখানেই কৃষকসভার নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেখানেই বেশিরভাগ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে, কখন ও বা কৃষক সভা আবার কোথাও বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষক মেয়েরা নারী বাহিনী গড়ে তুলেছে। অত্যন্ত জঙ্গি, সাহসী এবং ঝুঁকি নিয়ে এই বাহিনী সর্বত্র কাজ করেছে। যদিও তাদের হাতে অস্ত্র বলতে ঝাঁটা, লাঠি, ছদ্মগাইন, বোঁটি ইত্যাদি নিয়ে তারা প্রতিরোধে এগিয়েছে। এই বাহিনী কোথাও ঝাঁটা বাহিনী, কোথাও প্রতিরোধ বাহিনী, নারী বাহিনী, গাইন বাহিনী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতো। এই বাহিনীগুলি মূলত তৈরি হয়েছিল তাৎক্ষণিক আন্দোলনের প্রয়োজনে এবং বাহিনীর সমস্ত সদস্যরাই ছিল মূলত গরিব কৃষক খেতমজুর পরিবারের। এদের মধ্যে যেমন আদিবাসী, তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মেয়েরাই ছিল সংখ্যাধিক্য, তেমনি অল্প সংখ্যক হলেও মুসলিম মেয়েরা ও অংশগ্রহণ করেছিল এই প্রতিরোধ বাহিনীতে।[২৩]

অন্যদিকে প্রচন্ডভাবে আতঙ্কিত বড় বড় জোতদার - মালিক গোষ্ঠী জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে গিয়ে ধরনা দিতে থাকে। তাদের দাবি,- "সর্বনাশ হলো, গ্রামের ছোটলোকদের খেপিয়ে তুলেছে ওই লাল ঝাণ্ডার দল, ওরা ধান নিয়ে পালাচ্ছে, আমাদের কি হবে? এখনই পুলিশ চাই, ওই পান্ডাদের গ্রেপ্তার করুন। ওরা হিংসা, খুন-জখম, বেআইনি লুটপাট, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছে, ওদের দমন করুন"। ইংরেজ শাসকেরা ও তাদের এই গোলামদের রক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে থানায় থানায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পাঠাতে থাকে। আন্দোলনের সমস্ত এলাকাতেই মাঝে মাঝে পুলিশ ক্যাম্প বসে যায়। পুলিশ প্রধানত দখল করে গ্রামের জোতদারের বাড়ি, কাছারি বাড়ি বা গ্রামের স্কুলগুলি।[২৪] পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়

প্রত্যেকটি জমিদার বাড়িতে এবং আন্দোলন দমন করতে নন্দীগ্রাম থানাতেই শুধু ৭-৮ টি পুলিশ ক্যাম্প বসে ছিল, মনুচক, জলপাই, কেন্দেমারি, সাউদাখালি, টাকাপুরা, মহম্মদপুর, হানু ভূইয়া, ও বামুনআড়া গ্রামে।[২৫] ১৯৮২ সালে এ প্রসঙ্গে ধীরাজমোহন ভট্টাচার্য এক প্রবন্ধে বলেছেন, "অবাধ্য কৃষকদের শাস্তি দিতে এবং জোতদারদের স্বার্থ রক্ষায় মনুচক, কেন্দেমারি, কালীচরণপুর এবং পাশাপাশি গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়"[২৬]

এরপর মাঠের ধান খামারে তোলা শুরু হলে প্রকৃত সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। পুলিশকে এড়িয়ে মাঠের ভান নিজেদের খামারে বা যৌথ খামারে তোলার প্রস্তুতি কৃষকরা শুরু করে। ঠিক হয়, সকাল সকাল শত শত কৃষক পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করবে, আর সেই সময় মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে মাঠের ধান খামারে তুলবে। এ সময় কৃষকদের হটাতে পুলিশ বা লাঠিয়াল এলে মেয়েরা শাঁখ বাজাত, ঝাঁটা, বটি হাতে, কোচরে লঙ্কা নুন বালী নিয়ে পুলিশ ও লাঠিয়াল দের বাধা দিতে প্রস্তুত হয়। লাঠিয়াল ও গুন্ডাদের কাছারি বাড়ি থেকে বের করে কৃষকরা মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেয়, মেয়েরা ঝাঁটাপেটা করে। নারী বাহিনীর দাপটে গুন্ডারা গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করে, কেন্দেমারি তে অনন্ত মাঝি গ্রেপ্তার হয়, সুদাম জানা বঙ্কিম পাত্র প্রমুখকে পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে যেতে থাকে। বিমলা মাজী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে যান। এই ঘটনার পরেই মনুচকের দেওয়ান সাহেব কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তেভাগা দাবি মেনে নেন।[২৭] অন্যান্য ছোট ও মাঝারি জোতদারগণ ও তেভাগার দাবি মেনে নেন। কেশপুর থানার 4 নম্বর ইউনিয়নের নিম্নলিখিত ভাগ মালিকগণ তেভাগার দাবি মেনে নিয়ে রশিদ দিয়েছেন এবং অন্যান্য মালিকদের বেবাকার দাবি মানতে ও তেভাগা বিল পাস করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। স্বাক্ষরকারীগণ হলেন, কেশপুর থানার রাধাগোবিন্দ ঘোষ (তিলকগঞ্জ), সূর্য জাল (বড়াইবলি), শিবরানি দীক্ষিত (আমনপুর), সতীশ চন্দ্র পাত্র ও প্রমথনাথ বর (মহাবনকাটি), শীতল চন্দ্র ওঝা ও বিভূতিভূষণ পাত্র (আমনপুর)।[২৮]

অন্যদিকে কেঁদেমারির জানা পরিবার তেভাগার দাবি না মেনে পুলিশের সাহায্য নেয়। পৌষ মাসের একটা দিন প্রায় ৩০০ কৃষক ধান কাটা ও খামারে তোলার জন্য সমবেত হয়। বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে তাদের ঘিরে ফেলে, কৃষকদের সঙ্গে জোতদার বাহিনীর লাঠালাঠি শুরু হয়, কয়েকজন কৃষকের মাথা ফাটে। বিভিন্ন গ্রামে খবর দেয়। পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনী ভূপাল পান্ডা সহ কৃষকদের দড়ি দিয়ে ক্যাম্পে আটকে রাখে। ক্যাম্পে কৃষকদের পৌঁছানোর আগেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে গুলি চালাতে শুরু করে।[২৯] শুধু কেঁদেমারি নয়, জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশি অত্যাচারের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন সংবাদপত্রে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ধরা পড়ে। "সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নন্দীগ্রামের কেন্দেমারী গ্রামে এবং পাঁশকুড়ার চকদুর্গাপুর ও কলাগেছিয়া গ্রামে বহু স্ত্রী লোকের গহনাপত্র নিয়ে যায় এবং অমানুষিকভাবে মারপিট করে"। ১৯৪৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পাঁশকুড়া থানার চকগোপাল গ্রামে পুলিশ গুলি চালায়। বহু মানুষ আহত হয়। ৩০/৩৫ জন ভাগচাষীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।[৩০]

কিন্তু কমরেড বিমলা মাজীর নেতৃত্বে জঙ্গি কৃষক নারী বাহিনী দা, বটি, ঝাঁটা সহ কচরে গুলোর সঙ্গে লঙ্কা নুন নিয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে যায়। খামারের মধ্যে শুরু হয়ে যায় প্রথম সংঘাত। নারী বাহিনী কোচড় হতে লঙ্কা ধুলো ওড়ালে পুলিশ গুন্ডাদল তখন চোখের জালায় আতঙ্কবো বোধ করে পালাতে শুরু করে - এই সময় লাঠিধারী ভলান্টিয়ারদের তিন চার ব্যাচে স্লোগান দিয়ে পাড়ার ভিতর থেকে দৌড়ে আসতে দেখে ওই সশস্ত্র পুলিশ গুন্ডাবাহিনী ছুটে পালাতে বাধ্য হয়। কি খবর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত সংগ্রামী এলাকাগুলিতে। নন্দীগ্রাম মোহাম্মদপুরে কৃষক নারী বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশ ও গুন্ডাবাহিনীর এই সম্মুখ প্রতিরোধের কৌশল

জেলার সমস্ত সংগ্রামী এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র পুলিশ প্রতিরোধে কৃষক রমণীগণ অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছেন। যেমন পাঁশকুড়ার চক গোপাল চাষিদের খামার ভাঙ্গায় পুলিশ বাহিনীকেও বর্গ ক্ষত্রিয় মেয়েরা একইভাবে ঝাঁটা বটি নিয়ে প্রতিরোধ করে। শুধুমাত্র পুলিশের মোকাবিলা প্রতিরোধ নয়, পুলিশ আক্রমণ করলে কৃষকদের সতর্ক করার দায়িত্ব ও নিয়েছিল মেয়েরা। তাঁরা, শাঁখ বাজিয়ে, কাঁসর- ঘণ্টা বাজিয়ে ও অন্যান্যভাবে শব্দ করে গ্রামের পর গ্রামে পুলিশের হামলার খবর পাঠিয়ে দিতেন। রানী দাশগুপ্তের প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, "গ্রামে গ্রামে নারী বাহিনী পাহারায় নিযুক্ত হয়। গ্রামে পুলিশ ঢোকামাত্র শঙ্খ ঘন্টা কাঁসর বাজিয়ে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে মেয়েরা এবং কিশোর বালকেরা সারা গ্রাম কে হুশিয়ার করে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ ভলান্টিয়ার বাহিনীর প্রস্তুত হয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতো"।[৩১]

সে সময় পার্টির প্রাদেশিক নেতা ও এম.এল.এ জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দির সাথে মহিলাদের ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করে দেন। বিমলা মাজীর নেতৃত্বে অর্জন মহিলা প্রতিনিধিদল রূপনারায়ণ নদী পার হয়ে ডায়মন্ড হারবারে যান, সেখান থেকে শিয়ালদা হয়ে প্রাদেশিক দপ্তরে পৌঁছান। বিমলা মাজী ও চিত্ত গিরিদের নিয়ে জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিনিধি দলের নেত্রী বিমলা মাজী সমস্ত বন্দীদের মুক্তির দাবি করেন। মহিলা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার পর সূরাবর্দি, জ্যোতি বসুকে বন্দি মুক্তি ও তেভাগার অর্ডিন্যান্স জারির আশ্বস দেন। ভূপাল পান্ডা, অনন্ত মাজী সহ গ্রেফতার হওয়া সমস্ত কৃষকদের তমলুক আদালতে এনে মামলা প্রত্যাহার করে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্দীদের মুক্তির ফলে কৃষকদের সংগ্রামে উৎসাহ বাড়ে, অন্যদিকে জোতদারদের মনোবল ভাঙতে থাকে, তারা তেভাগা মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ সালে বর্গাদার অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে বর্গাদার আইন পাস হয়, তেভাগার সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়।[৩২]

আন্দোলনের তাৎপর্য:

তেভাগা আন্দোলন তৎকালীন ইংরেজ শাসক সহ কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও গ্রামীণ জোতদার, জমিদার, প্রক্রিয়ার শক্তির মধ্যে ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। তেভাগা তথা দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপকভাবে মেয়েদের উপস্থিতি এই আন্দোলনকে সার্থকতা দান করেছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই অবিভক্ত বঙ্গ দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্ম হয়েছিল এবং মহিলা সমিতির নেত্রীবৃন্দ গ্রামীণ মহিলাদের সুখ-দুঃখের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের একান্ত আপন হয়ে উঠেছিল। সমিতির নেত্রী রাই সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে কৃষক মেয়েদের সচেতন করার যে উদ্যোগ নিয়েছিল, সেই দিনের জগদ্দল সামাজিক বাধার পাহাড়কে ঠেলে তাদের সামাজিক চেতনায় যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা এক ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড।

ধ্যান ধারণা আচার-আচরণ আর ব্যবহার রীতির মধ্যে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল ঝেঁটে পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়ল মহিলা সমিতি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ রীতি, বিধবা বোনদের প্রতি ভাইদের মনোভাব ও আচরণ, ছেলে মেয়ে পালন করার ধারা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা খাদ্য ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যবিধি, সংসারের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার আর আপন জনের মতো মানসিকতা ও ব্যবহার রীতি- প্রতিক্ষেত্রেই মহিলা সমিতির সংগ্রাম প্রসারিত হলো। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্র জীবন বোধ, সামাজিক সম্পর্ক আর ব্যবহার রীতি সবকিছুই বদলে দেওয়ার অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হলো। তেভাগা আন্দোলন ও মহিলা সমিতির এই সংগ্রাম কৃষক সমাজে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে তুলেছিল।[৩৩] তেভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম সার্থকতা হল, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের সম্মিলিত সংগ্রাম।

তফশিলি ও আদিবাসী অংশের কৃষক ও কৃষক রমণীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সবাই বিপ্লবী আবেগ, গভীর আত্মবিশ্বাস ও দায়বদ্ধতা থেকেই এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। তাদের সাহসিকতা বুদ্ধিমত্তা সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা উন্নত চেতনা ও মূল্যবোধ সত্যিই বিস্ময়কর। হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে বিমলা মাজীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,- "নন্দীগ্রামের কেন্দেমারীতে মহিলাদের এক সভায় যোগ দিয়েছিলাম। যে গ্রামে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সেখানে প্রায় ১০০ জন মহিলা জড়ো হয়েছিলেন। যাঁদের অর্ধেক ছিলেন মুসলিম। পর্দা প্রথা ও সমানভাবে শক্তিশালী ছিল। মহিলারা বোরখা ও পরতেন"।[৩৪]

এই আন্দোলনের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভরতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে অবদমিত থাকার পরে পশ্চাৎপদ অংশের মহিলারা একদিকে যেমন আত্মরক্ষা সমিতি নারী বাহিনী গঠন করে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি সেদিন কৃষক সবার নেতৃত্বে মেয়েরা আর্থিক স্বাধীনতা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিল। সেজন্যই যেমন একাধিক হাতের কাজ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল ,আবার গৃহে উৎপাদিত সবজি অথবা হাঁস মুরগির ডিম বিক্রি করে সেই অর্থ যাতে বাড়ির মেয়েরা পায় তার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। এমনকি কোন কৃষক সংগঠনের সদস্য মদ্যপ অবস্থায় বা অন্য কোন কারণে স্ত্রীকে মারবে না এই সিদ্ধান্ত ও গৃহীত হয় সংগঠনের মহিলা নেত্রীদের দাবিতে।[৩৫]

১৯৪৭ সালে ভবানী সেন তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন,- "সবচেয়ে অবদমিত, পদদলিত, পশ্চাৎপদ ও নিরক্ষর কৃষক রমণী ধান রক্ষায়, তাদের ঘরবাড়ি সম্মান রক্ষায় আর রক্ত পতাকা রক্ষায় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে।... বাংলার গ্রামের নারী সমাজকে এই প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন। কৃষক বীরাঙ্গনা, মহিলা বক্তা ও প্রচারা অভিযানকারীরা এবং গ্রামের মহিলারা, যারা এই তেভাগা সংগ্রামে প্রায়শই পুরুষদের নেতৃত্ব দিত, বাংলার সমাজ জীবনে এক নতুন রেনেসাঁ র ইঙ্গিতবহ" । কৃষ্ণ বিনোদ রায় তাঁর প্রবন্ধ লিখেছেন, - "নারীগণ এই আন্দোলনে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা ইতিহাসে গাঁথা হয়ে থাকবে।... এঁদের তুলনাহীন সাহসিকতা, প্রত্যুৎপন্নমতি, সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষমতা, উন্নততর সাংস্কৃতিক চেতনা সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল"।[৩৬]

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস, ড. রতন কুমার। আধুনিক ভারতের ইতিহাস ১৮৫৮-১৯৬৪ প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম। কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৫৪৭।

২. মল্লিক, সমর কুমার। আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ ১৮৫৭–১৯৪৭। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা – ৬৮১।

৩. বিশ্বাস, ড. রতন কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ– ৫৪৭– ৪৮।

৪. মাজী, বিপ্লব, (সম্পা)। মেদিনীপুর চর্চা' বলাকা। কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা– ১৬৭।

৫. Mondal, Dipta Sundar. ' বাংলায় তেভাগা আন্দোলন ও সলিল চৌধুরীর গণসংগীত: ফিরে দেখা' , Pratidhwani the Echo, A Peer- Reviewed International Journals of Humanities and Social Science, Vol - Vll, Issue - l, July 2018, Karimganj, Assam, India, Page - 125.

৬. রায়, সুপ্রকাশ। বিদ্রোহী ভারত ১৭৬৩ – ১৯৮২। র‍্যাডিকেল, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা– ২৩৪।

৭. বিশ্বাস, ড. রতন কুমার। প্রাগুক্ত, পৃ – ৫৪৮ – ৪৯।

৮. মাজী, বিপ্লব। প্রাগুক্ত, পৃ– ১৬৮।

৯. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত। বাংলার তেভাগা তেভাগার সংগ্রাম। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা– ৮৭।

১০. রায়, সুপ্রকাশ। প্রাগুক্ত, পৃ– ২৫৭।

১১. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ– ৮৯.

১২. গুপ্ত, শ্যামলী। বঙ্গ নারীর প্রগতি প্রবাহ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা– ২০১।

১৩. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৬৮.

১৪. সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার অনলাইন.

১৫. Custers, Peter, ' Women's Role in the Tebhaga Movement - An Interview with Bimala Maji', Manushi No 3, No - 32, (January - February), 1986, P - 29.

১৬. গুপ্ত, শ্যামলী। প্রাগুক্ত, পৃ – ২০১.

১৭. সম্পাদকীয়, আনন্দবাজার অনলাইন।

১৮. Dusters, Peter. Women's Role in Tebhaga Movement. Economic and Political Weekly Vol - XXl, No 43, Review of Women Studies, October 25, 1986, P - 100.

১৯. গুপ্ত, শ্যামলী। প্রাগুক্ত, পৃ– ২০২.

২০. প্রাগুক্ত, পৃ– ২০৩।

২১. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৬৯।

২২. রায়, সুপ্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ– ২৫৭ -৫৮।

২৩. গুপ্ত, শ্যামলী, প্রাগুক্ত, পৃ– ২০৩।

২৪. রায়, সুপ্রকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ– ২৫৮।

২৫. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৬৯।

২৬. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ– ৮৮।

২৭. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৬৯ – ৭০।

২৮. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ– ৮৭।

২৯. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৭০।

৩০. ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, প্রাগুক্ত, পৃ– ৮৬।

৩১. চট্টোপাধ্যায়, কুনাল। তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১০৭।

৩২. মাজী, বিপ্লব, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৭০।

৩৩. গুপ্ত, শ্যামলী, প্রাগুক্ত, পৃ– ২০০।

৩৪. Custers, Peter, Ibid, P– 30.

৩৫. গুপ্ত, শ্যামলী, প্রাগুক্ত, পৃ– ১৮০।

৩৬. চট্টোপাধ্যায়, কুনাল, প্রাগুক্ত, পৃ– ১০১।